সত্যজিতের পরশুরাম

শান্তনু চক্রবর্তী

অফিস ফেরতা আচমকা বৃষ্টিতে ডালহৌসি-পাড়া থইথই। হেড আপিসের বড়বাবুর রোজরে'জ মুখঝামটা, বড় সাহেবের হুমকি ছাড়াও বেচারির তস্য বেচারি বাঙালি কেরানিকুলকে পিষে ফেলার সবরকম অস্ত্র যে প্রকৃতির ভাঁড়ারে মজুদ! নইলে ভর বিকেলবেলা, অফিস ভাঙার ঠিক মুখটায় আকাশ ভেঙে এমন ঝমঝমিয়ে নামবে কেন? জুতো-কোঁচা-ছাতা সব সামলে ট্যাঙোস-ট্যাঙোস করে হেঁটে বাড়ি ফেরা ৫৩ বছরের শ্রী পরেশচন্দ্র দত্ত ওই কেরানি-প্রজাতিরই একজন। সেদিনই আপিসে সদ্য ছাঁটাইয়ের নোটিশ আর বিকেলেই বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত তিনি মাথা বাঁচাতে আশ্রয় নিয়েছিলেন কার্জন পার্কের ওই ছোট, গোল ঘরটাতে। সেখানে তাঁর মতই ঝুপসি ভেজা আরও অনেক মানুষের সঙ্গে গা-ঘেঁষাঘেষি করে বিরস-বিরক্ত মুখে। একেই সংসারের নুনটুকু জোগাড় করতে করতে পান্তা ফুরোয়, তার হিসাব কষতে কষতেই আচমকা আকাশ থেকে ঠকাং করে কী একটা জিনিস মাটিতে ঠিকরে পড়ে পরেশবাবুর পায়ের কাছে গড়িয়ে এল। গোল মার্বেলের মত দেখতে নুড়ি পাথরটা কুড়িয়ে নিয়ে তিনি তাঁর বাংলা সার্টের পকেটে রাখলেন। এভাবেই পরশপাথর প্রথমবার পরেশবাবুর জিম্মায় এল। আর এভাবেই পরশুরাম ওরফে রাজশেখর বসুর গল্প অবলম্বনে সত্যজিৎ রায়ের 'পরশপাথর' ছবির শুরুটা হয়। এই ছবিটা করার আগে সত্যজিৎ তাঁর 'অপু ট্রিলজি'র দুটো ছবি বানিয়ে ফেলেছেন এবং তারশঙ্করের কাহিনী নিয়ে 'জলসাঘর'-এর শ্যুটিং শুরু করে দিয়েছেন। সেখানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তথা বাংলার ফিউডাল-তন্ত্রের শ্মশানে পোড়ো ভগ্নস্তূপের মত দাঁড়িয়ে থাকা টলিউডি অভিজাততন্ত্রের শেষ প্রতিনিধি ছবি বিশ্বাস! কিন্তু তপন সিংহের 'কাবুলিওয়ালা'-র জন্য পুরস্কার আনতে ছবিবাবু লম্বা বিদেশ সফরে থাকবেন। ফলে অনেকদিন তাঁর 'ডেট' পাওয়া যাবে না। সেই ফাঁকটায় পরপর সিরিয়াস ছবির চাপ কিছুটা কমাতে সত্যজিৎ খানিকটা কমেডির অবকাশ খুঁজছিলেন। যাকে বলে একটু 'ব্রেক' নেওয়া। সেজন্যই রাজশেখর বসু বা 'পরশুরাম'-এর এই গল্প বেছে নেওয়া— যেখানে রঙ্গ, রূপকথা, ব্যঙ্গ, প্রহসনের পাশেই টলটল করছে দু-এক ফোঁটা বেদনাও। ছবিটা মুক্তি

লেখক প্রখ্যাত সিনেমা সমালোচক। এখনও অব্দি প্রকাশিত গ্রন্থ— *জনপ্রিয় সিনেমা, বলিউডের জনগণমন, ইতিহাসের সীমানা পেরিয়ে, এক ছিলিম ফিলিম*। sanajkd@gmail.com

পাওয়ার আগে এক চিঠিতে তাঁর জীবনীকার মারী সিটনকে এমন কথাই লিখেছিলেন সত্যজিৎ। গ্রাম-প্রকৃতির রূপসী-মায়াবী সবুজে কলম ডুবিয়ে লেখা বিভূতিভূষণের সঙ্গে সত্যজিতের পরিচয় যেমন 'পথের পাঁচালী'র কিশোর সংস্করণ 'আম আঁটির ভেঁপু'-র অলঙ্করণ করতে গিয়ে, রাজশেখরের বেলাতেও ব্যাপারটা অনেকটা তাই। তাঁর কিছু লেখার অলঙ্করণের সময়েই 'পরশুরাম'-এর গদ্য কুঠারটি বিলক্ষণ চিনেছিলেন সত্যজিৎ।

চিত্রনাট্য রচনা নিয়ে আলোচনার সূত্রে সত্যজিৎ বেশ কয়েকবার রাজশেখর বসুর কাছে গিয়েছিলেন। সেই অভিজ্ঞতার কথা তিনি বলেছিলেন 'সত্যজিৎ রায়: দ্য ইনার আই' বইয়ের লেখক অ্যান্ড্রু রবিনসনকে। যাঁর কলমে কৌতূকরসের অমন অনায়াস, স্বতঃস্ফূর্ত বাণ ডাকে, সেই মানুষটা বাইরে ততটাই গম্ভীর। বেশ অবাক হয়েছিলেন সত্যজিৎ। "ওঁকে হাসতে দেখা একটা বিরল ঘটনা", অ্যান্ড্রুর কাছে কবুল করেছিলেন তিনি। রাজশেখরকে দেখে তাঁর অনেকটা লিমেরিকের স্রষ্টা এডোয়ার্ড লিয়রের কথা মনে হয়েছিল। লিয়রের মতই গাম্ভীর্যের খোলোস, ভেতরের রসের ভাঁড়ারে উঁকিঝুঁকি মারার সমস্ত রাস্তা আটকা। আবার লিয়রের মতই ব্যঙ্গচিত্রের হাতটাও পাকা। পরশুরামের গল্পের সঙ্গে যতীন্দ্রকুমার সেনের যে বিখ্যাত অলঙ্করণগুলো আমরা দেখে থাকি, সেগুলোর অনেক কটির প্রাথমিক ড্রয়িংটা রাজশেখরেরই। তার মানে 'পরশপাথর' ছবির প্রস্তুতি পর্বে দুই শিল্পীর মুখোমুখি মোলাকাতের একটা ব্যাপার ঘটেছিল। হলিউডের ভাষায় যাকে 'এনকাউন্টার অব টাইটান্স' গোছের বলা যায়। এখানে দু-তরফের খানিকটা পারস্পরিক বৌদ্ধিক জল-মাপামাপির জায়গা অবশ্যই ছিল। যদিও সত্যজিৎ বহু আগে থেকেই রস শিল্পী রাজশেখরের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। সুকুমার রায়ের পুত্র, প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ শিল্পী সত্যজিতের নামের সঙ্গে রাজশেখরেরও পরিচয় ছিল। তাছাড়া 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত' ছবির সূত্রে সত্যজিতের সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পর্কেও তিনি নিশ্চয়ই অবহিত ছিলেন।

কিন্তু এটা তো শুধু বাইরের চেনা-জানা পরিচয়। 'পরশ-পাথর' ও পরবর্তী পর্বে 'বিরিঞ্চিবাবা' অবলম্বনে 'মহাপুরুষ' এই দুটি ছবিতে সত্যজিৎ-রাজশেখর যুগলবন্দী বাঙালির সামাজিক সাংস্কৃতিক ইতিহাসের আরও দুয়েকটা আলগা সুতোয় গিঁটও কিন্তু বেঁধে দিয়েছিল। এমনিতে তো এটা দুজন হিউমার-শিল্পীর পারস্পরিক গাঁটছড়া। মাধ্যমটা আলাদা হলেও দুজন শিল্পীরই কৌতুকের ধারণা দাঁড়িয়ে আছে মিত-কথন আর পরিমিতিবোধের উপর। দুজনের কেউই ব্যঙ্গের অস্ত্র উঁচিয়ে বিপক্ষের উপর চড়াও হন না। কিন্তু সমাজ-রাজনীতির অসঙ্গতি গুলোকে যেখানে যেমন বিদ্ধ করা দরকার, সেই কাজের কাজটা কখনো ভোলেন না। তাছাড়া দুজনেরই হিউমার চর্চার ধারাটা পারিবারিক। সত্যজিতের ক্ষেত্রে সেটা অন্তত দুই প্রজন্মের। এদিকে রাজশেখর, বড়দা শশিশেখর এবং ছোটভাই গিরীন্দ্রশেখর তিনজনেই কৌতুকরস সৃষ্টিতে সিদ্ধহস্ত। আর দুই পরিবারেই এই সৃজনশীলতার শিকড়টা ছড়ানো রেনেসাঁর বৌদ্ধিক-সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারে। উনিশ শতকের এই উত্তরাধিকার-ঐতিহ্য গোড়া থেকেই

ইউরোপীয় 'এনলাইটমেন্ট'-এর আলোয় স্বদেশকে চিনতে চেয়েছিল। পশ্চিমের আহরণকে দেশজ অভিজ্ঞতায় মেলাতে চেয়েছিল। সেদিক থেকেও সত্যজিৎ আর রাজশেখর কোথাও একই জায়গায় চলে আসেন। সত্যজিৎ তাঁর প্রথম ছবিটিতে বাঁশবাগান, হিজল বন, কাশফুলের স্বপ্ন ইমেজ মাখামাখি বিভূতিভূষণের একান্ত দেশি, গ্রামীণ আখ্যানে ইউরোপীয় আর্ট-সিনেমার ছবি-প্রকরণ, ব্যকরণ ব্যবহার করেন। কিন্তু সেই প্রয়োগ কোথাও দেশজ শিকড় থেকে এতটুকু বিচ্ছিন্ন হয় না। সেটা আইজেনস্টাইন—পুদভকিন সোভিয়েত সিনেমার প্রেরণা হতে পারে কিংবা ডি-সিকার ইতালিয় নিও-রিয়ালিজম— সত্যজিৎ কোনোরকম বেখাপ্পা ঝাঁকুনিহীন, আশ্চার্য মসৃণতায় তাকে নিশ্চিন্দিপুরের গ্রাম্য বাস্তবতায় অনায়াসে ঠাঁই করে দিয়েছেন। এইভাবেই রাজশেখরও বিভিন্ন হিউমার সাহিত্য, বিশেষকরে পি জি ওডহাউস আর স্টিফেন লীককের লেখায় গভীরভাবে প্রাণিত হয়েছেন। অথচ সেই সব কাহিনীর ছায়ায় পরশুরামের যে ন্যারেটিভগুলো সৃষ্টি হয়েছে, সেগুলো আমর্ম বাঙালি। উনিশ শতকীয় নবজাগরণের উত্তরাধিকার বাহিত, এই শিক্ষিত, শহুরে (বা কলকাত্তাইয়া), 'বাঙালিয়ানা'ও সত্যজিৎ-রাজশেখরের আর একটা 'কমন' দাঁড়াবার জায়গা। উচ্চবর্ণ তথা উচ্চবনেদি 'ভদ্রলোক' বাঙালির অহঙ্কার, আত্মাভিমান,আত্মবিলাপ (বা আপশোষ), এমন কী কিছু কিছু পূর্ব নির্ধারিত সংস্কার বা 'কমপ্লেক্স'ও রাজশেখর-সত্যজিৎ সৃজন প্রক্রিয়ায় ছায়া ফেলে থেকেছে। রাজশেখরের কাহিনী নিয়ে সত্যজিৎ পরিচালিত দুটি বা বলতে গেলে দেড়খানা ছবির আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা 'বাঙালিত্ব'র এই সাংস্কৃতিক রাজনীতিটিও বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব।

আমাদের আলোচনাটা শুরু হয়েছিল পরেশবাবুর পরশপাথর পকেটস্থ করার ঘটনা দিয়ে। ওই পাথরের জাদু ক্ষমতা তখনও তার অজানা। তখনও অবধি পরেশবাবু একজন সৎ, সরল, নিরীহ, ভীতু, নির্ভেজাল বাঙালী কেরানি। অফিসের সাহেব থেকে গলির মোড়ের পাহারাওয়ালা— ক্ষমতার যেকোনো স্তরের মানুষজনকেই তিনি সভয়ে ও সসম্ভ্রমে এড়িয়ে চলেন। নিঃসন্তান প্রৌঢ় পরেশবাবু তাই কোনোরকম স্বার্থ মতলব ছাড়াই নেহাত স্নেহপ্রবণতায় পাশের বাড়ির শিশু পল্টুকে মার্বেল-সাইজের পাথরটা দিয়ে দেন খেলবার জন্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের স্মৃতি তখনও টাটকা। পল্টু পুতুল সৈন্যসামন্ত সাজিয়ে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলছিল। পরেশবাবুর পরামর্শমাফিক ওই পাথরটা হবে সেই খেলনা যুদ্ধের নকল অ্যাটমবোমা। তখনও তো কারোরই জানা নেই, দেশের ব্যাঙ্ক, অর্থনীতি, সোনা-রূপোর বাজারে ওই একরত্তি পাথরটা কত বড় বোমা ফাটাতে চলেছে। পল্টুর যুদ্ধ যুদ্ধ খেলার দৌলতে ধাতব সেনা-পুতুলের গায়ে নুড়ি-পাথরের বোমা চার্জ করতে গিয়েই প্রথম পরশপাথরের ম্যাজিক শক্তির কথা জানা যায়, আর তাতেই উথাল-পাতাল কেঁপে যায় পরেশবাবুর এতকালের নিরুপদ্রব শান্তির জীবন।

পল্টুর লোহার পুতুল পাথরের ছোঁয়া লেগে সোনা হয়ে গেছে দেখেই পরেশ বুঝে যান

কোন সাতরাজার ধন জাদু-মানিক তাঁর মুঠোয় এসেও প্রায় ফসকে যেতে বসেছে! আর এইখানে দাঁড়িয়েই ছবির প্রথম বাণিজ্যিক 'ডিল'-টা ঘটে যায়। ছোট্ট পল্টুর কাছ থেকে পরশপাথরটা ফেরত পাওয়ার জন্য গুচ্ছের লজেন্স টফি চকলেট বিস্কুট আরও কত রকম খেলনাপত্তরের ভেট সাজিয়ে পরেশবাবু আরও একবার তাঁদের গলির ধারের জানলার সামনে এসে দাঁড়ান। পাড়ার স্টেশনারি দোকান থেকে ওই 'ঘুষ' দেওয়ার জিনিসগুলো কেনার দৃশ্যে পরেশবাবুর ভূমিকাভিনেতা তুলসী চক্রবর্তীর অভিনয়-দক্ষতার অসাধারণ টাচ্ দেখা যায়। পরেশ তখন সদ্য পরশপাথরের অলৌকিক ক্ষমতার আন্দাজ পেয়েছেন। জিনিসটা কীভাবে তাঁর বিড়ম্বিত ভাগ্য, নড়বড়ে সংসারের হাল ফিরিয়ে দিতে পারে, সেই হিসাটাও তাঁর কষা হয়ে গেছে। এবার ঠিক কী ধরনের উপহারে পল্টুর মন ভোলানো যাবে, প্রবল উত্তেজনা আর টেনশনে তিনি সেটা ঠিক করে উঠতে পারছিলেন না! এটা-ওটা-সেটা, 'ভালো -ভালো' কী কী জিনিস দিয়ে তাঁর কাজটা উদ্ধার হবে তিনি ভেবেই পাচ্ছিলেন না।

পরেশবাবুর সেই অস্থির অস্থির উত্তেজিত বিভ্রান্ত দশাটা তুলসী চক্রবর্তী চোখে মুখে এবং গোটা শরীরে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। কয়েকঘন্টা আগেই অফিসে ছাঁটাইয়ের নোটিশ দেখে আসা কেরানিবাবু পরেশ দত্ত চোখের সামনে জ্যাকপট দেখতে পাচ্ছেন। তাই পল্টুর জন্য জিনিস কেনাটা ছিল তাঁর মরিয়া 'ইনভেস্টমেন্ট'! তবে পাথরটা বাগানোর জন্য তিনি যতটা মরিয়া ছিলেন, পাথরের জাদু-শক্তি ব্যবহার করার ব্যাপারে সফল ব্যবসায়ীর আগ্রাসী বেপরোয়া অ্যাডভেঞ্চার প্রবণ দুঃসাহস তিনি কখনোই দেখাতে পারেননি কারণ রাজশেখর এবং সত্যজিৎ পরেশচন্দ্রকে মানসিকতার দিক থেকে নেহাতই ভীতু, পাতি, কেরানি বাঙালি করেই রেখেছেন। দুর্নীতিবাজ, পাক্কা বেওসায়ি হয়ে ওঠার 'কিলার ইনস্টিঙ্কট্' বা দেশের আইনকানুনের মাথায় মুনাফার কাঁঠাল ভাঙার সাহস যোগাননি। কারণ তাঁরা দুজনেই ঊনিশ শতাব্দীর নবজাগরণের শিক্ষা সংস্কৃতির অভিমানজাত ধারণা থেকেই মনে করতেন— ওটা বাঙালির কম্ম নয়। খানিকটা শিক্ষাদীক্ষা আছে, এমন উচ্চমধ্য বা নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালির পক্ষে ফায়দা আর ফাটকাবাজির বাণিজ্য-খেলায় নামা সম্ভব নয়।

ওটা পরশুরামের 'সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' গল্পের গাণ্ডেরিরাম বাটপারিয়াদের মত অবাঙালি 'বেওসায়ি'-দেরই মানায়। মজার ব্যাপার হল সত্যজিৎ তাঁর 'জয়বাবা ফেলুনাথ'-এ ছোট্ট রুকুর প্রিয় রহস্য রোমাঞ্চ সিরিজের ভিলেনের নাম দিচ্ছেন 'ডাকু গণ্ডারি'! আর মূল কাহিনীর খলনায়ক মগনলাল মেঘরাজ তো ভাবে-ভাষায়, মুনাফাপ্রবণতায় স্পষ্টতই একটি বিশেষ বণিক সম্প্রদায়কেই প্রতিনিধিত্ব করে। 'পরশপাথর'-এও শেষ অবধি যে লোকটি রাগে হিংসায় জ্বলে পুড়ে লোহাকে সোনা করার রহস্যখানি খবরের কাগজে ফাঁস করে দেন, তিনিও তো পোশাকে-আসাকে-টুপিতে তিলকে টিপিক্যাল মারওয়ারবাসী, কলকাতা প্রবাসী। যেন রাজশেখরের 'কজ্জলি' বা 'গড্ডলিকা'-য় যতীন্দ্রকুমার সেনের আঁকা কোনো স্কেচ থেকে বেমালুম সিনেমার পর্দায় উঠে এসেছেন! এই লোকটির বাড়ির পার্টিতেই অনেকটা নেশার ঝোঁকে ও খানিকটা ওই আসরের অতিথি শহরের

বনেদি অভিজাত অর্থবান সমাজের উদাসীন উপেক্ষার জবাব দিতেই পরেশবাবু তাঁর পরশপাথরের ম্যাজিকটা 'পাবলিক' করে ফেলেছিলেন। ব্যবসায়ী ভদ্রলোক তারপরেও সব চেপেচুপে গিয়ে পরেশবাবুর সঙ্গে একটা বাণিজ্যিক চুক্তি বা 'ডিল'-এ আসতে চেয়েছিলেন। সেখানে সোনা বানানোর ফর্মুলা গোপন থাকবে। লাভের বখরা পাবেন দুতরফই।

কিন্তু পরেশবাবু সেই অফারটাকে পাশ কাটিয়ে 'উড়ে-মেড়ো-খোট্টা-তেঁতুল'দের প্রতি বাঙালির সহজাত তথা স্বভাবজ তাচ্ছিল্যেই, ওই মারওয়ার-সন্তানটিকে সোনা তৈরির 'আদি সংস্কৃত' মন্ত্রের নাম করে সুকুমার রায়ের "হলদে সবুজ ওরাংওটাং/ইঁটপাটকেল চিৎপটাং ছড়ার লাইন ক'টা লিখে দেন। সেইসঙ্গে পরেশ-বেসী তুলসীবাবু তাঁর অনুনকরণীয় সংলাপ ডেলিভারির ভঙ্গিতে ফর্মুলার অনুপাতটাও বুঝিয়ে দেন— "ইঁটটা কম, পাটকেলটা বেশি"! স্বাভাবিকভাবেই পরেশবাবুর ওই রসিকতাটি শেঠজীর হজম হওয়ার কথা নয়। আর তারপর যে 'অ্যামেজিং কেস'-খানি ঘটল, যার জেরে একদিকে সোনা-রূপোর বাজারে ধ্বস নামল, আবার সেই তুলকালাম কাণ্ডের 'কজেটিভ ফ্যাক্টর' ওই ম্যাজিক পাথরটাও পরেশবাবুর সেক্রেটারি প্রিয়তোষ হেনরি বিশ্বাসের পেটের ভিতর বিলকুল হজম হয়ে গেল, সেটা তো এই ফ্যান্টাসি-প্রহসনের ক্লাইম্যাক্স। তবে তার আগে তো ওই বিখ্যাত ককটেল পার্টির দৃশ্যটার কথা বলতে হয় যেখানে অতিথিদের ভিড়ে টালিগঞ্জের প্রায় সমস্ত চরিত্রাভিনেতা এবং অভিনেত্রীরাই হাজির ছিলেন। এবং তারা স্রেফ মুখ দেখাননি। সত্যজিৎ তাঁদেরকে কিছু না কিছু 'বিজনেস' দিয়েছিলেন। আর সেভাবেই তাঁরা 'ক্রীম অফ ক্যালকাটা' হিসাবে এই পার্টির দৃশ্য জুড়ে বিরাজ করেছেন— এবং প্রত্নবস্তু স্বরূপ এই 'বাদামি' সাহেবদের প্রতি সত্যজিতের তীব্র বিরাগ, অশ্রদ্ধা ফুটিয়ে তুলেছেন।

আসলে সত্যজিৎ এখানে এক ঢিলে বেশ কটি পাখি মেরেছেন বা মারতে চেয়েছেন। অ্যান্ড্রু রবিনসন এই প্রসঙ্গে বড়লোকিপনা, শো-অফ এবং মদ্যপান তথা মাতলামির ব্যাপারে সত্যজিতের সহজাত বিতৃষ্ণার কথা তুলেছেন। সেই সূত্রে সত্যজিতের 'ব্রাহ্ম' পারিবারিক ঐতিহ্যের কথা বলেছেন। এমনকী তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং সত্যজিতের অধিকাংশ ছবির শিল্প নির্দেশক বংশী চন্দ্রগুপ্তকেও সাক্ষী মেনেছেন। কিন্তু গোটা সিকোয়েন্সটার নির্মাণ বা 'বিল্ড আপ' দেখলে বোঝা যায় সত্যজিৎ এখানে নেহাত মদ্যপান বিরোধী নীতিবাগীশ, ব্রাহ্ম ছুৎমার্গবাদী নন। তাঁর পরিষ্কার একটা গেম প্ল্যান আছে। আগের দৃশ্যেই আমরা সেক্রেটারির কাছে শেঠজির বাড়ির ককটেল পার্টির নেমন্তন্নের খবর শুনে পরেশবাবুকে ডগমগ আহ্লাদে ভেসে যেতে দেখেছি। পার্টিতেও বনেদি রইস রাজহংস-হংসীদের ভিড়ে পরেশচন্দ্র আদেখলে উঠতি বড়লোক বকের মত চারিদিকে ঠুকরে বেড়ান। এ সন্ধ্যায় তাঁর সাজগোজ-পোশাকেরও কী বাহার! পরশপাথর পেয়ে বাড়ি-গাড়ি, খানিকটা ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স করে ফেলার পরে পরেশবাবু ধুতি পাঞ্জাবির সঙ্গে মাথায় সাদা গান্ধি টুপি পরে সভা-সমিতিতে যাচ্ছিলেন। ভোটে দাঁড়াবার প্রাক-প্রস্তুতি

হিসাবে দেদার মেডেলও বিলোচ্ছিলেন। স্বাধীন ভারতের শাসক দল কংগ্রেসের রাজনৈতিক কালচারের (আসলে নানা দুর্নীতি, কেলেঙ্কারিরও) প্রতীক এই গান্ধি টুপির ব্যবহার নিয়ে সেন্সর বোর্ডের আপত্তি ছিল। তবু সত্যজিৎ পরেশচন্দ্রের টাক ঢাকার অজুহাত দেখিয়ে টুপিটা অনুমোদন করিয়ে নিয়েছিলেন। তবে পার্টিতে তাঁর মাথায় কালো টুপি, উত্তমাঙ্গে বাহারি সাদা প্রিন্স-কোট। অপমান-আক্রমণে কোণঠাসা পরেশই অনভ্যাস-অস্বস্তির কোটটাকে খুলে ফেলে ভিতরের চিরায়ত হাত কাটা ফতুয়ার গোঁজ থেকে পাথরটা বার করেই তাঁর ম্যাজিক দেখান। আর এই যে পরেশবাবু প্রিন্স কোটটিকে ছুঁড়ে ফেলে তাঁর মোহ আবরণ ঘোচালেন, এখান থেকেই তাঁর পড়ে পাওয়া (নাকি কুড়িয়ে পাওয়া) 'সৌভাগ্যে'র গিল্টি খসানোর পালা শুরু। ছবির একেবারে ক্লাইম্যাক্সে, প্রিয়তোষ—সেক্রেটারির পেটের ভিতরে পাথরটা যখন পুরো হজম হয়ে যায়, আর ওই জাদু-পাথরের ছোঁয়ায় যেখানে যত লোহা সোনা হয়েছিল, সেগুলো আগের চেহারায় ফেরত আসে, তখন পৃথিবীতে আবার আপাতত শান্তিকল্যাণ হয়ে যায়! প্রথম সোনা বিক্রির টাকা ট্যাঁকে নিয়ে পরেশবাবু ট্যাক্সিতে উঠে বলেছিলেন— "আগে একটু হাওয়া খাব। আজকের দিনটা বড় ভাল," আর একদম শেষেও পরশপাথরের টেনশন মুক্ত পরেশবাবুকে একই সংলাপ বলতে শোনা যায়।

পরশুরামের মূল-কাহিনীর স্যাটায়ার-এর হুল 'হিউম্যানিস্ট' সত্যজিতের হাতে আর একটু বেশি সহনীয় হয়ে ওঠে। সমকালীন রাজনীতি-অর্থনীতি-দুর্নীতির চক্রটাকে যতটা চাবকানো যেত, সত্যজিৎ ততটা নির্মম হন না। পরেশবাবুর দুর্নীতির মাত্রাটা বেশ ছোট। তাঁর লোভ পেপারওয়েট, চশমার খাপ, সুপুরি কাটা জাঁতি আর কালোয়ারপট্টির গুদাম থেকে কুড়িয়ে আনা ক'টা মিউটিনির লোহার গোলাকে সোনা করার চেয়ে বেশি এগোয় না। ওইটুকুর ভিতরেই তাঁর বাড়ি গাড়ি সেক্রেটারির চাকরি এবং শেঠজির পার্টির 'কেলেঙ্কারি' সবটুকু ঘটে যায়। তাঁর দেশবরেণ্য নেতা হওয়ার স্বপ্নও তেমন সিরিয়াস কিছু ব্যাপার নয়। তাঁর রাজনীতিতে নামার ইচ্ছেটা বিখ্যাত হওয়ার একটা বিকল্প রাস্তা মাত্র। গান্ধি টুপির ভেক নিয়ে তাই সেন্সর বোর্ডও বিশেষ ঘাঁটাঘাটি করে না। পরেশবাবুর ফ্যান্টাসিতে তাঁর নিজস্ব মূর্তি প্রতিষ্ঠা বা উদ্বোধন একটা চমৎকার কৌতুক-দৃশ্যের ভাবনা। মাইক্রোফোনে একঘেয়ে গলায় নিজের প্রশস্তি শুনে মূর্তিরূপী পরেশবাবুর হাসি-হাসি মুখে অনুমোদনের ঘাড় নাড়াটাও দুর্দান্ত মাস্টার টাচ। ভীষণ বুদ্ধিদীপ্ত, নির্মল মজার দৃশ্য। রায়বাড়ির কৌতুকচর্চার সঙ্গে ভীষণ মানানসই। কিন্তু পরশুরামের ব্যঙ্গের কুঠারটা সত্যজিৎ এখানে নামিয়েই রাখলেন।

সত্যজিতের সিনেমা-শিল্পকে যিনি স্পষ্টতই মার্কসবাদী আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন, সেই অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় 'পরশপাথর'-এর সঙ্গে ডি-সিকার 'মিরাক্‌ল ইন মিলান' ছবির মিল পেয়েছেন। তবে ডি-সিকা যেভাবে তাঁর ছবিতে ফ্যান্টাসি বা জাদুবাস্তবকে প্রায় একটা জগৎ করেছেন, 'পরশপাথর'-এ সেটা নেই। এখানে 'অলৌকিক' বা অতি-প্রাকৃতিকও পাতি কেরানির রোজকার ভাত-ডাল-আলুপোস্ত-চুনো মাছের সঙ্গে গা

জড়াজড়ি করে থাকে। তাছাড়া এটা সত্যজিতের তেমন উচ্চাকাঙ্খী কোনো ছবিও নয়। আগেই বলা হয়েছে, পরিচালকের কাছে এটা অনেকটাই অবকাশের ছবি—তীব্র করুণ হৃদয়াবেগ নির্ভর পরপর কাজকর্মের মাঝখানে একটু বিরতি নেওয়ার ছবি। ফ্যান্টাসি তাই এখানে সত্যজিতের কাছে পারিপার্শ্বিক বা সিচুয়েশনাল কমেডি নির্মাণের একটা সুযোগ। সিচুয়েশনাল কমেডির সঙ্গে খানিকটা স্ল্যাপস্টিক, কিছুটা স্যাটায়ার মিশিয়ে 'পরশপাথর'-এর কাঠামো তৈরি হয়েছিল। এখানে স্ল্যাপস্টিক-এ লোক হাসানোর দায়িত্বটা ছিল পরেশবাবুর বাড়ির পুরনো চাকরের ভূমিকায় জহর রায়ের। কিন্তু চার্লি চ্যাপলিনের জবর ভক্ত জহরবাবু স্রেফ সুড়সুড়ি বা সুড়সুড়ির অকারণ বাড়াবাড়ি হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছেন। যেটা তাঁকে বা সত্যজিৎ কাউকেই মানায় না। আর রাজশেখরের কাহিনী নিয়ে ছবির ক্ষেত্রে যা আরোই নয়।

'পরশপাথর'-এর সিরিও-কমিক চলনে তবু ব্যাপারটা অনেকটাই সামলানো গেছে। এখানে হাসির সঙ্গে করুণ রস মিশেছে নিপুণ অনুপাতে। আর চিত্রনাট্যের এই ধূসর এলাকাটাই দুর্ধর্ষ কাজে লাগিয়েছেন তুলসী (পরেশ) চক্রবর্তী মশাই। দেশের চলতি আইনে অপরাধী পরেশচন্দ্রের প্রতি সত্যজিতের যে মমতা ও সহানুভূতি, নিপুণ চিত্রকরের মত তুলসীবাবু সেই চরিত্রে নানান শেড-এর আলোছায়া খেলিয়েছেন। তবুও সোজা সরল আবার মতলবী, লাজুক আবার বেহায়া, সেই তুলসীর সৃজিত সেই পরেশবাবুর প্রেমে আমরা এতটাই মজে থাকি যে অন্য কিছু ভাববার ফুরসতই থাকে না। কিন্তু পরশুরামের 'বিরিঞ্চিবাবা' যখন সত্যজিতের 'মহাপুরুষ' হচ্ছেন, তখন কাজটা পরিচালকের জন্য একটু কঠিন হয়ে যাচ্ছে। কারণ রাজশেখরের এই গল্পটা দাঁড়িয়ে আছে নানা মাত্রার শ্লেষাত্মক সংলাপের উপর, যেখানে দম-ফাটা মজা আর চিনচিনে খোঁচা দুটোই সমান টের পাওয়া যায়। সত্যজিতের বন্ধু তথা কলকাতার ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনে তাঁর অন্যতম সহযাত্রী চিদানন্দ দাশগুপ্ত যাকে বলেছেন 'ভার্ভাল স্ল্যাপস্টিক'! এবং চিদানন্দের মতে 'মহাপুরুষ'-এ সত্যজিৎ রাজশেখরের নানান মজার ও চলনের কৌতুক নির্মাণের সঙ্গে মোটেই তাল রাখতে পারেননি। তিনি মনে করেন, 'বিরিঞ্চিবাবা' গল্পটায় রাজশেখর যেমন একই সঙ্গে ভারিক্কি আবার ফুরফুরে নির্ভার—তেতো কষটা আবার মিষ্টি মোলায়েম— সিনেমাকার হিসাবে সত্যজিৎ সে ভাবে চড়ায় খাদে সমান সূক্ষ্ম-দক্ষতা দেখাতে পারেননি। এই লেখক, সিনেমা তাত্ত্বিক ও পরিচালকের হিসাবে সত্যজিৎ যখনই অন্যের সাহিত্য নিয়ে ছবি করেছেন, তা সেটা রবীন্দ্রনাথই হোক, কিংবা বিভূতিভূষণ বা তারাশঙ্কর, তিনি বরাবরই মূল কাহিনীর সাহিত্যগুণকে ছাপিয়ে, নিজের সৃজনশীলতা প্রতিষ্ঠা করেছেন। কিন্তু 'মহাপুরুষ'-এ রাজশেখরের প্রতিভার সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে তিনি শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ। 'মহাপুরুষ'-এর সমালোচনায় চিদানন্দ এতটাই কড়া এবং নির্মম যে তিনি এতদূরও মন্তব্য করেছেন, এই ছবিই সত্যজিতের 'ওয়াটার্লু'। এখান থেকেই তাঁর ফুরিয়ে যাওয়া শুরু। তাঁর সৃজন-প্রতিভার গ্রাফ এখান থেকেই নামতে নামতে 'চিড়িয়াখানা'য় একেবারে নিম্নতম সূচক ছুঁয়ে ফেলে। আমরা অবশ্যই এই মন্তব্যের সাথে সহমত নই।

কারণ ষাটের দশকের শেষেই তিনি 'গুপি গাইন বাঘা বাইন' আর 'অরণ্যের দিনরাত্রি'র মত সম্পূর্ণ দু-ধরনের দুটো অসাধারণ ছবি করেছেন।

'মহাপুরুষ' সম্পর্কে এই সমালোচনা চলতেই পারে যে 'কাপুরুষ'-এর মত একেবারে ভিন্ন মেজাজের অন্য একটি ছবির সঙ্গে এই ছবিটার নাম জুড়ে দেওয়াটা ঠিক কি না? কিন্তু হিন্দুধর্মের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যে লড়াইটা তিনি 'দেবী' থেকে শুরু করেছিলেন এবং 'গণশত্রু' অবধি যে যুদ্ধ জারি থেকেছে, 'মহাপুরুষ' অবশ্যই তার একটা উল্লেখযোগ্য পর্ব। হ্যাঁ, অবশ্যই তেমন সিরিয়াস-বুদ্ধিদীপ্ত কোনো কাজ নয়। সত্যজিতের 'প্রধান' ছবির তালিকায় এ সিনেমার নাম কেউ করবে না। কিন্তু আমাদের তথাকথিত শহুরে একটি 'গুরুদেব' বা বাবা কালচারের কাঁচের ঘর তাক করে পাটকেলটা তিনি ঠিকই ছুঁড়ে দিলেন। ছবির গোড়ায় যে মহাপুরুষ চলন্ত ট্রেনের জানলা দিয়ে 'ওঠ্ ওঠ্' করে সূর্যোদয় ঘটান— দু-হাতের আঙুল একই সঙ্গে ঘড়ির কাঁটার চলনের দিকে ও উল্টোদিকে ঘুরিয়ে নির্বোধ ভক্তদের চমকে দেন— বুদ্ধ-যীশু সব্বাইকে 'স্বচক্ষে দেখা' সেই বাবাটিকে ছবির শেষে তার বুজরুকি কারবার গুটিয়ে পালাতে হয়। ওইটুকু সত্যজিতের সাফল্য। ক্লাইম্যাক্সে অন্ধ জনতার বুদ্ধির গোড়ায় 'বৈজ্ঞানিক ধোঁয়া'র দৃশ্যটা অবশ্যই তেমন জমে না। তাছাড়া মূল গল্পে'র একদম শেষে, সত্যর করা প্রোপজ-এর উত্তরে বুঁচকির লাজুক 'যাঃ'— আর আড্ডাধারীদের ব্যাখ্যামাফিক সেই না-বাচক 'যাঃ' মানেই যে আসলে 'হ্যাঁঃ', এই ছোট, টানাপোড়েনে 'রম্-কম্'য়ের যে মিষ্টি নরম মজাটা আছে, ছবিতে সেটাও ঠিক আসে না। কিন্তু 'মহাপুরুষ'-এর একেবারে শেষ দৃশ্যে পলায়নপর বাবাজীর ব্রহ্মা-সাজা চেলার নকল কাঠের হাতে ঝুলতে থাকা ছিনতাই করা লেডিজ ব্যাগের টাচ্‌টা নির্ভুল সত্যজিতোচিত। আর এইটুকুতেই রাজশেখর আর সত্যজিতের রসবোধের রসায়ন মননের একই তাপমাত্রায় মিলেজুলে একাকার হয়।